Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XII, Issue-I, October 2023, Page No.18-25
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

স্বামী বিবেকানন্দের জাতীয়তাবাদী ভাবনা: একটি সম্যক বিশ্লেষণ

বিজয় মন্ডল

সহকারী অধ্যাপক, মানকর কলেজ, মানকর, পূর্ব বর্ধমান

Abstract:

Swami Vivekananda was one of the brightest stars in the history of Indian nationalism. He is labelled as a nationalist, whose writings and activities have a great impact on Indian youth. He played a great role in growing Indian nationalism in the late 19th and 20th century. Through the concept of nationalism in India is attributed to the western influence but Vivekananda's idea on nationalism is closely associated with religion and spirituality. Keeping this in view, the present paper explores the growth of nationalism in India and tries to investigate the formation of Indian Nationalism through the eyes of Vivekananda.

Keywords: Swami Vivekananda, Nationalism, Internationalism, Patriotism, Humanity, Religion, Spiritualism.

নরেন্দ্রনাথ দত্ত, যাকে বিশ্ব স্বামী বিবেকানন্দ নামে চেনে, ছিলেন এক অসাধারণ উজ্জ্বলতম ব্যক্তিত্বের অধিকারী। বৈদান্তিক ধর্ম-দর্শনের অধিকারী ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও তিনি রাজনীতি, জাতীয় মুক্তি আন্দোলন, জাতীয়তাবাদ, আন্তর্জাতিকতাবাদ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাঁর বক্তব্য পেশ করেছেন। বর্তমান এই গবেষণামূলক পত্রটির আলোচ্য যখন বিবেকানন্দের জাতীয়তাবাদী চেতনা, তখন তাঁর জাতীয়তাবাদী ভাবনা পর্যালোচনার আগে বিবেকানন্দের বড় হয়ে ওঠার সময় টিকে একটু লক্ষ করা যাক, তাতে তাঁর চিন্তাভাবনার একটি পরিস্ফুট দিক পাওয়া যাবে। বিবেকানন্দ তাঁর নিত্যান্তই সংক্ষিপ্ত জীবনে এতসব অবদান রেখে গেছেন যে তাঁর যতই আলোচনা হোক না কেন তা কমই হবে। উত্তর কলকাতার সিমলা পল্লীর বিখ্যাত দত্ত পরিবারে ১৮৬৩ সালের ১২ ই জানুয়ারি (১২৬৯, সোমবার ২৯ পৌষ) কৃষ্ণা সপ্তমীর মকর সংক্রান্তিতে তাঁর জন্ম। তিনি ছিলেন ধর্মগুরু শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের একান্ত প্রিয়তম ও অনুগত শিষ্য। তিনি তাঁর এই স্বল্প জীবনে একদিকে যেমন ধর্ম প্রচার, ধর্ম সংস্কার, শিবজ্ঞানে জীব সেবা প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর নিরলস কর্ম প্রয়াস চালিয়ে গেছেন অন্যদিকে তেমন জাতীয় মুক্তি আন্দোলন, সমাজবাদ, জাতীয়তাবাদ প্রভৃতি রাজনৈতিক বিষয়ক ক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্য পেশ করেছেন। আবার একই সাথে ভারতীয় দর্শন ও হিন্দু ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য ছিল।

পশ্চিমী উদারনৈতিক জাতীয়তাবাদী মতাদর্শে বিশ্বাসী ভারতের জাতীয় কংগ্রেস যখন প্রতিষ্ঠিত হল, তখন বিবেকানন্দের বয়স বাইশ। বস্তুত স্বামীজি যে যুগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেই ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে জাতীয়তাবাদ তো দূরের কথা, ভারতীয়ত্বের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। তবে তৎকালীন কিছু সামাজিক, রাজনৈতিক আন্দোলন যেমন ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলন, বিদ্যাসাগর-দয়ানন্দের সমাজ ও ধর্ম

সংস্কার আন্দোলন বা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নরমপন্থী রাজনীতি গোটা দেশে ভারতীয়দের এক সুতোয় বেঁধে কোনো জাতীয়তাবাদের জন্ম দিতে পারেনি। কারণ সেই সময় ভারত ছিল বিভিন্ন আঞ্চলিক পরিচয়ে বিভক্ত, কিছু কিছু মানুষ ছিল বাঙালি, মারাঠি, উড়িয়া, পাঞ্জাবি, মাড়োয়ারি প্রভৃতি পরিচয়ে বিভক্ত আবার কিছু ছিল হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, শিখ, জৈন প্রভৃতি ধর্মীয় পরিচয়ে বিভক্ত। যাই হোক পরবর্তীকালে, নবজাগরণের প্রভাবে শিক্ষিত ও রাজনীতি সচেতন কিছু এলিট শ্রেণী সমগ্র ভারতকে একটি জাতি হিসেবে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়। বাস্তবিকপক্ষে পশ্চিম থেকে আহরিত আধুনিক জাতীয়তাবাদ বিবেকানন্দকে যেমন প্রভাবিত করেছিল তেমনি ভারতের ধর্ম, জাতপাত প্রভৃতির বন্ধন থেকে মুক্ত করে কিভাবে সকলের মধ্যে জাতীয় ঐক্য গড়ে প্রতিষ্ঠা করা যায় সে বিষয়েও তিনি চিন্তিত ছিলেন। তিনি মনে করতেন, 'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর'।

'জাতীয়তাবাদ' কথার সহজ অর্থ হল একটি আবেগ বা মানসিক অনুভূতি, যাকে এককথায় বলা যায় যা মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে ও জাতি গঠন করতে সাহায্য করে। ইহা হলো এমন একটি মহান আদর্শ যা জাতীয় জনসমাজকে ঐক্যের ভিত্তিতে জাতি গঠনে অনুপ্রাণিত করে। তবে বিবেকানন্দের জাতীয়তাবাদী চেতনায় আধ্যাত্মিক বিশ্বাস বড় ছিল। তাঁর এই আধ্যাত্মিক ভিত্তি ছিল আবেগপ্রবণ। তাঁর মতে জাতির প্রতি একাত্মতাবোধ ও শ্রদ্ধায় হলো জাতীয়তাবাদ। তিনি মনে করতেন দেশের মানুষজনকে জাতি বলে আখ্যা দেওয়ার পূর্বে তাদের একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও আদর্শ থাকা আবশ্যক, কারণ একক কোনো উদ্দেশ্য বা আদর্শ ছাড়া কোনো জাতি চলতে পারে না। এই আদর্শই সেই জাতির মেরুদন্ড যাকে তিনি জাতীয় আদর্শ বলে থাকেন। তিনি বলেন "প্রত্যেক জাতির একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য আছে... যতদিন উক্ত জাতি সেই আদর্শকে ধরিয়া থাকিবে ততদিন কিছুতেই তাহার বিনাশ নাই।" (বিবেকানন্দ, ১৩৬৭) আগেই বলা হয়েছে বিবেকানন্দের জাতীয়তাবাদী চেতনায় আধ্যাত্মিকতার দিকটি বেশি। কারণ তিনি মনে করতেন একমাত্র আধ্যাত্মিকতার পথ ধরেই ভারতীয় জাতীয়তাবাদ বিকশিত লাভ করবে। তাই আমাদের দেশে 'জাতি'-কে জীবন্ত করে তুলতে হলে জনগণের মনে আদর্শ, পবিত্রতা, আত্মত্যাগ প্রভৃতি মনোভাব জাগিয়ে তুলতে হবে, কারণ এছাড়া এর অন্য কোনো পথ নেই! বিবেকানন্দের মতানুযায়ী একমাত্র ধর্ম তথা আধ্যাত্মিক চেতনার মাধ্যমে ভারতে এক শক্তিশালী জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠতে পারে। তবে এই আলোচনা প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ তাঁর 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' নামক গ্রন্থে পশ্চিমী সভ্যতা ও আমাদের দেশের জাতীয়তাবাদের মধ্যে একপ্রকার পার্থক্য রেখা অঙ্কন করেছেন। তাঁর মতে পাশ্চাত্যে জাতীয় ঐক্যের ভিত্তি হলো রাজনৈতিক মতাদর্শ, কিন্তু ভারতে সেই জাতীয় ঐক্য গড়ে ওঠার ভূমিকা নেয় ধর্মীয় ঐক্য। কিন্তু ভারত হল বৈচিত্রের দেশ, এখানে হিন্দু, বৌদ্ধ, ইসলাম, খ্রিষ্টান প্রভৃতি নানা ধর্মের মানুষের বাস, তাহলে এখানে কিপ্রকারে ধর্মীয় ঐক্য গড়ে উঠবে? এই প্রশ্নের উত্তরে বিবেকানন্দ বলেন আপাত ধর্মীয় দিক থেকে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও এমন কিছু সাধারণ মূলনীতি রয়েছে যা আমাদের সকলকে চালনা করে। তাই বিবেকানন্দ এক্ষেত্রে বলেন আমাদের সকলের উচিত ধর্মীয় বিরোধগুলিকে ভুলে জাতীয় ঐক্যের জন্য এক হওয়া। এক্ষেত্রে এটা মনে হতেই পারে যে বিবেকানন্দ অন্যান্য ধর্মের থেকে হিন্দু ধর্মকে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু একথা সত্য নয়। তিনি অন্ধভাবে নিজ জাতির প্রতি ভালোবাসা ও অপর জাতিকে বিদ্বেষের চোখে দেখাকে কখনোই সমর্থন করেননি। কারণ তাঁর কাছে ধর্ম জাতি অপেক্ষা অনেক বেশি গুরুত্ব পেয়েছিল মানবিক সত্তা। তাঁর ভাবনার সর্বাগ্রে ছিল মানুষের স্থান। তিনি জাতির উন্নয়নের জন্য মানুষের মধ্যে সততা, নিষ্ঠা, ভালোবাসা, স্বার্থত্যাগ প্রভৃতি সদগুণগুলির অনুশীলনের ওপর গুরুত্ব

দিয়েছিলেন। স্বামীজির মতানুযায়ী ব্যক্তি সমূহের সমষ্টি হল জাতি, তাই এই ব্যাক্তি সমষ্টির নৈতিক মূল্যবোধ ও আচরণ বিকশিত হলেই জাতির উন্নয়ন সম্ভব। তিনি জাতীয় ঐক্যের রক্ষার্থে নৈতিক ভিত্তির উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। জাতির পুনর্জাগরণের জন্য আত্মত্যাগ ও জনসেবামূলক কাজকর্মের আদর্শকে মূল ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করতে হবে বলে তিনি মনে করতেন। তাই তিনি বলতেন, "আমি ভারতবাসী, প্রত্যেক ভারতবাসী আমার ভাই। বল মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, চন্ডাল ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী আমার ভাই। তুমিও একটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া, সদর্পে ডাকিয়া বল, ভারতবাসী আমার ভাই, ভারত বাসি আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, পবিত্র স্বর্গ, আমার বার্ধক্যের বারানসী। বল ভাই ভারতের মৃত্তিকা আমার সর্বোচ্চ স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ...।" (বিবেকানন্দ, ১৮৯৩, পৃ. ৬৫) জাতপাতের মধ্যেই ক্ষুদ্র বর্ণ বিভাগীকরণকে তিনি কখনোই সহ্য করতেন না। কারণ তিনি মনে করতেন সমাজের মধ্যে থাকা এই বর্ণবিভাগ জাতিকে কোনোদিন উন্নত করতে পারে না।

বঙ্কিমচন্দ্রের মতো বিবেকানন্দ আমাদের দেশকে মাতৃরূপে কল্পনা করতেন। পরবর্তীকালে আবার ঋষি অরবিন্দও একই ভাবে ভারতমাতাকে মা ভবানীর স্বরূপ বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। তাঁর নিকট ভারতমাতা দেবী প্রতিমার সমান। তাই তিনি বলতেন আমাদের দেশকে যদি আমরা নিজের মাতৃরূপে ভক্তি ও সেবা করি তাহলে একদিন এই দেশ পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হতে পারবে। এই উদ্দেশ্যে তিনি সকল ভারতবাসীর নিকট আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, "আগামী পঞ্চশৎ বর্ষ ধরিয়া সেই পরম জননী মাতৃভূমি যেন তোমাদের আরাধ্যা দেবী হন, অন্যান্য অকেজো দেবতাগণকে এই কয়েক বর্ষ ভুলিনি কোনো ক্ষতি নাই" (বিবেকানন্দ, ১৯৬৪) । তিনি ভারতীয় সমাজে এই জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার জন্য একমাত্র ধর্মীয় ঐক্যের পথ বেছে নিয়েছেন।

বস্তুতপক্ষে এই পর্যন্ত আমরা বুঝতেই পারছি যে স্বামীজীর জাতীয়তাবাদ ছিল জাতির তথা দেশের কল্যাণ সাধনের এক সামগ্রিক আত্মিক প্রয়াস। তাঁর জাতীয়তাবাদে স্থান পেয়েছে সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষজন । দেশের দরিদ্র, অবহেলিত, নিপীড়িত, অত্যাচারিত মানুষজনের প্রতি ছিল তাঁর অগাধ ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা। তাই তিনি বলেছিলেন: "তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙ্গল ধ'রে, চাষার কুটির ভেদ ক'রে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হ'তে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড় জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে। এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে, নীরবে সয়েছে, -তাতে পেয়েছে অপূর্ব সহিষ্ণুতা। সনাতন দুঃখ ভোগ করেছে, -তাতে পেয়েছে অটল জীবনীশক্তি। এরা এক মুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উলটে দিতে পারবে; আধখানা রুটি পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরবেনা; এরা রক্তবীজের প্রাণ সম্পন্ন। আর পেয়েছে অদ্ভুত সদাচার- বল, যা ত্রৈলোক্যে নাই।" (বিবেকানন্দ, ১৯৬১, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ:৮২) তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে দেশের সাধারণ জনসাধারণের উন্নয়ন ছাড়া রাজনৈতিক ব্যবস্থার উন্নয়ন সম্ভব নয়। তিনি তাঁর জাতীয়তাবাদের ধারণায় সাধারণ জনগণের মধ্যে কখনোই কোনো প্রকার বর্ণবৈষম্য বা ভেদাভেদকে স্বীকার করেননি। তিনি সমাজে ব্রাহ্মণদের অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধাকে কখনোই স্বীকার করেননি। আমাদের সমাজে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র -এই চার বর্ণের মানুষের বাস, তাই কোনো একবর্ণের ভিন্ন, অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা বা পৃথক জাতীয়তাবাদ থাকতে পারে না। তাঁর পরিবর্তে এইসকল বর্ণের মানুষজনদের সম্মিলিত প্রয়াসে গড়ে উঠবে ভারতের জাতীয়তাবাদ, যেখানে স্থান পাবে জাতির প্রতি

শ্রদ্ধা ভালোবাসা ও দেশ ভক্তি। তিনি বলতেন, "বর্ণ বিভাগ জাতির উন্নতির প্রতিবন্ধক।" (বিবেকানন্দ, ১৯৬৪, সপ্তম খন্ড, পৃ:৭)

স্বামীজি একটি সুসংহত সুসমৃদ্ধ ভারত গড়ে তোলার কথা ভেবেছিলেন। বিভিন্ন মহান আদর্শ ও মহৎ গুণ গুলির ভিত্তিতে অতীতে আমাদের জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠেছিল। তাই স্বামীজি এই মহৎ গুণগুলিকে পুনরায় উজ্জীবিত করার কথা বলেছেন। তবে এক্ষেত্রে তিনি পাশ্চাত্য অন্য জাতিকে অনুকরণ করার পরিবর্তে অন্য জাতির মহান আদর্শগুলিকে অনুসরণ করার কথা বলেছেন। তিনি বলেন অন্য জাতির যেসব ভালো গুণগুলি রয়েছে সেগুলিকে গ্রহণ করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ পাশ্চাত্যের নারী স্বাধীনতার ভাবনাকে তিনি আদর্শ বলে গ্রহণ করেছিলেন। কারণ তিনি চাইতেন আমাদের দেশের নারীগণ গৃহের মধ্যে বন্দি থাকার পরিবর্তে সেই স্বাধীনতা অর্জন করুক। তিনি বলতেন ভারতের নারীরাও সেবা, ত্যাগ ও সমতার আদর্শকে গ্রহণ করে চলবে। নারী মুক্তির উদ্দেশ্যে তিনি বলেছিলেন: "মেয়েদের পূজা করে সব জাত বড় হয়েছে। যে-দেশে যে-জাতে মেয়েদের পূজা নেই, সেই দেশে সে-জাত কখনো বড় হতে পারেনি, কস্মিনকালে পারবেও না। ... স্ত্রী জাতির অভ্যুদয় না হইলে ভারতের কল্যাণের সম্ভাবনা নাই। এক পক্ষে পক্ষীর উত্থান সম্ভব নহে।" (বিবেকানন্দ, ১৩১৯, পৃ:২০৪) অর্থাৎ স্বামীজি দেশের পূর্ণ স্বাধীনতার পূর্বে নারীমুক্তি যে একান্ত আবশ্যক তাঁর আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি অন্য জাতির ভালো গুণগুলিকে নিজ জাতির মধ্যে আত্তীকরণের কথা বলেছিলেন। কারণ তাঁর মতে একমাত্র এই আত্তীকরণের মাধ্যমেই একটি জাতি সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত ও বিশ্বে সুমর্যাদাসম্পন্ন স্থানে অধিষ্ঠিত হতে পারবে। তিনি স্পষ্টতই বুঝেছিলেন দেশের সকল শ্রেণীর মানুষের কল্যাণ না ঘটলে জাতির কল্যাণ ঘটা সম্ভব নয়। তিনি চেয়েছেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের যেসব আদর্শ ও মূল্যবোধগুলি রয়েছে সেগুলির মধ্যে যুক্তিসম্পন্ন সংমিশ্রণ ঘটাতে।

স্বামীজীর সময়কালে ভারতীয় জনগণ পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি যে অন্ধ আনুগত্য প্রদর্শন করেছিল সে বিষয় নিয়ে তিনি যথেষ্ট শঙ্কিত ছিলেন, কারণ এই পরনির্ভরতা জাতিকে আরো দুর্বল করে তোলে। তিনি অন্য জাতি তথা সভ্যতার মহৎ গুণগুলিকে আত্তীকরণের কথা বললেও সবক্ষেত্রে তার অন্ধ অনুকরণকে অন্য জাতির দাসসুলভ বলে ঘৃণা করেছেন। তবে এই বিষয়টিকে বিবেকানন্দের ভারতের উগ্র জাতীয়তাবাদ বললে ভুল বলা হবে। কারণ স্বামীজী ছিলেন এক উদার ও যুক্তিসম্পন্ন জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী। তাই তিনি স্বজাতি তথা ভারতকে সকল জাতির ঊর্ধ্বে রাখার পরিবর্তে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যাবতীয় মহৎগুণগুলি সংগ্রহের কথা বলেছেন। তিনি তাঁর 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থে ভারতীয় জনতার উদ্দেশ্যে আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, "এ সত্য কথা, এটি ভোলবার কথা নয়। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা, বীর্য্যপ্রকাশ কর, শাম, দান, ভেদ, দণ্ডনীতি প্রকাশ কর, পৃথিবী ভোগ কর, তবে তুমি ধাম্মিক। আর ঝাঁটা লাথি খেয়ে, চুপটি করে, ঘৃণিত জীবন যাপন করলে, ইহকালেও নরকভোগ, পরলোকেও তাই। এইটি শাস্ত্রের মত।... অন্যায় করো না, অত্যাচার করো না, যথাসাধ্য পরোপকার করো।" (বিবেকানন্দ, ১৯৬৩, পৃ.৭) স্বামীজীর জন্মের সমসাময়িক সময়ে ভারতীয় সমাজে ভারতীয় ধারণার কোনো অস্তিত্ব ছিল না। বস্তুত সেই সময়ে ভারত ছিল সাম্প্রদায়িক দিক থেকে বিভক্ত যুক্তিহীন ধর্মীয় আচার বিচার, ধর্ম ও সমাজ চিন্তার ক্ষেত্রে জাতি ছিল জরাগ্রস্ত, এহেন সেই পরিস্থিতিতে ভারতকে তিনি একটি সার্বভৌম জাতীয় ঐক্য সৃষ্টির স্বপ্ন দেখেছিলেন। বস্তুত ছিন্নবিচ্ছিন্ন খন্ডিত ভারতীয় সত্তাকে তিনি ধর্মের বন্ধনে আবদ্ধ করে ভারতীয়ত্ব ভাবনা গঠন করতে চেয়ে ছিলেন।

বিবেকানন্দ হিন্দু ধর্ম ও সামাজিক সংস্কারের জন্য ঔপনিবেশিক শাসনকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। তাঁর ধারণা ছিল উপনিবেশিক ইংরেজ প্রবর্তিত আইন গুলির মাধ্যমে ধর্ম ও সমাজসংস্কার সাধিত হবে এবং জাতির চিন্তা-চেতনায় কাম্য পরিবর্তন সূচিত হবে যার ফলস্বরূপ দেশে স্বদেশ চেতনা ও জাতীয় ঐক্য গঠিত হবে। মধ্যযুগীয় ধর্মীয় ধ্যান-ধারণার কবল থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণতা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। কারণ একমাত্র পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারের মাধ্যমে দেশে ব্যাক্তিস্বাধীনতা, যুক্তিবাদিতা, সাম্য, মূল্যবোধ ও নারী পুরুষের মধ্যে সমানাধিকারের ধারণা প্রতিষ্ঠিত হবে। ব্রিটিশদের পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে ইতিবাচক মন্তব্য করলেও স্বামীজি ব্রিটিশ শাসকদের খ্রিস্টধর্মের আগ্রাসনে হিন্দু ধর্মযে বিপন্নতার মুখে এসে দাঁড়াচ্ছে তা বেশ উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি ব্রিটিশদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন : "তবে বিদেশি, তুমি যত বলবান নিজেকে ভাব, ওটা কল্পনা ; ভারতেও বল আছে, বস্তু আছে, এইটি প্রথম বোঝ। আর বোঝ যে, আমাদের এখনও জগতের সভ্যতা ভান্ডারে কিছু দেবার আছে, তাই আমরা বেঁচে আছি।" (বিবেকানন্দ, ১৯৬৩, পৃ:৪) পাশাপাশি তিনি উল্লেখ করেছেন : "ঐ যে হিমালয় পাহাড় দেখছ, ওরির উত্তরে কৈলাস, সেথা বুড়োশিবের প্রধান আড্ডা। ও কৈলাস দশমুণ্ড কুড়ি-হাত রাবণ নাড়াতে পারে নি, ও কি এখন পাদ্রী ফাদ্রীর কম্ম! ঐ বুড়োশিব ডমরু বাজাবেন, মা কালী পাঠা খাবেন, আর কৃষ্ণ বাঁশী বাজাবেন, -এদেশে চিরকাল। যদি না পছন্দ হয়, সরে পড় না কেন?" (বিবেকানন্দ, ১৯৬৩, পৃ:৪) বিবেকানন্দ তৎকালীন রক্ষণশীল গোঁড়া হিন্দু সমাজপতিদের ধর্মীয় অনাচার ও অন্যান্য ব্যবস্থাগুলির বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। তিনি জাতি ও ধর্মের কল্যাণার্থে হিন্দু ধর্মের পুনঃনির্মাণের প্রধান বাধাস্বরূপ পুরোহিতের দলকে এমন ধাক্কা দিতে চেয়েছিলেন যেন তারা 'ঘুরপাক খাইতে খাইতে একেবারে আটলান্টিক মহাসাগরে গিয়া পড়ে...'। সমাজের মধ্যে থাকা অন্যায় প্রথাগুলিকে তিনি কখনোই সমর্থন করেননি । তাই এক্ষেত্রে সমাজ সংস্কারক রাজা রামমোহন রায় ও বিদ্যাসাগরের প্রতি তিনি ব্যক্তিগতভাবে গভীর শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। বস্তুত রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের মতো সমাজসংস্কারকগণের মনুষ্য জাতির প্রতি প্রগাঢ় মানবপ্রেম ও প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী ধ্যান-ধারণা তাঁকে গভীর ভাবে আলোড়িত করেছিল। বিশেষ করে রামমোহনের বেদান্ত ধর্মগ্রহণ ও প্রচার এবং হিন্দু-মুসলমানের প্রতি পক্ষপাতহীন ভালোবাসা তাঁর মনে দাগ কেটেছিল। তিনি রামমোহনের অসাম্প্রদায়িক জাতীয় চেতনাকে সমর্থন করেছিলেন। একথাও ঠিক যে তিনি সমকালীন ভারতীয় সমাজ সংস্কারকদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকলেও কিছু বিষয় তিনি এই সংস্কার আন্দোলনগুলির সমালোচনা করেছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল যে ভারতীয় সমাজ সংস্কারকগণ আমাদের দেশের সমাজের বা জীবনচর্চার মূল ধারাটি ঠিকমতো রপ্ত করতে পারেনি। সমাজসংস্কারকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন: "এটি তোমরাও বেশ করে বোঝ, যারা অন্তর্বহিঃ সাহেব সেজে বসেছ এবং 'আমরা নরপশু', 'তোমরা হে উয়োরোপী লোক, আমাদের উদ্ধার কর' বলে কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছ।" (বিবেকানন্দ, ১৯৬৩, পৃ:৪) স্বামীজীর মতে শুধুমাত্র ধর্ম সংস্কার বা জাতিভেদ দূরীকরণের দ্বারা দেশে জাতীয়তাবাদের বিকাশ সম্ভব নয়। তিনি বলতেন জাতীয়তাবাদ একটি মানসিক তথা একটি আত্মিক উত্তরাধিকার যার মধ্যে দিয়ে আমাদের প্রত্যেককেই জীবন ধারণ করতে হবে অর্থাৎ ইহা হল একটি অনুভূতি চিন্তা ও জীবনধারণ পদ্ধতি। বিশেষত দুটি কারণকে কেন্দ্র করে তাঁর চিন্তা চেতনায় ভারতীয় ঐক্যের প্রতি ধারণা পরিবেষ্টিত হয়েছিল- এক, ভারতীয় ইতিহাসের প্রতি তাঁর গভীর জ্ঞান অর্জন এবং দুই, সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ। তিনি তাঁর পরিব্রাজক জীবনকালে আসমুদ্রহিমাচল কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা, কচ্ছ থেকে কামরূপ ভ্রমণকালে ভারতীয় জনজীবন সম্পর্কে বিপুল তথ্য জ্ঞান আহরণ করেছিলেন। সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ কালে তিনি লক্ষ্য

করেছিলেন তাঁর ভাতৃসম ভারতীয় সন্তানগণ জাতপাত উচ্চ-নিচ বর্ণবৈষম্য প্রভৃতি নানা খেলায় ব্যস্ত। যা তাকে ভারতীয় ঐক্য গঠনের জন্য আরো বেশি বিচলিত করে তুলেছিলো। এই পরিভ্রমণ কালে তিনি ভারতের অসংখ্য ধর্ম, বর্ণ, ভাষাভাষী মানুষের সাথে মিলিত হয়েছিলেন।

স্বামীজি তাঁর জাতীয়তাবাদের ধারণায় ভাবগত বা ধর্মীয় ঐক্যের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন এ কথা আমরা সবাই জানি, কিন্তু এর পাশাপাশি একথা আমাদের ভুললে চলবে না যে, তিনি নিজ জাতির প্রতি অন্ধপ্রেম, স্বজাতি বাৎসল্যের কথা বললেও অন্য প্রতিবেশী জাতির প্রতি বিদ্বেষভাবকে কখনোই সমর্থন করেননি। এই প্রসঙ্গে তিনি তাঁর 'বর্তমান ভারত' প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন : "একান্ত স্বজাতি-বাৎসল্য ও একান্ত ইরান-বিদ্বেষ গ্রিক জাতির, কার্থেজ-বিদ্বেষ রোমের, কাফের-বিদ্বেষ আরব জাতির, মুর-বিদ্বেষ স্পেনের, স্পেন-বিদ্বেষ ফ্রান্সের, ফ্রান্স-বিদ্বেষ ইংলন্ড ও জার্মানির এবং ইংলন্ড-বিদ্বেষ আমেরিকার উন্নতির-প্রতিদ্বন্দ্বিতা সমাধান করিয়া- এক প্রধান কারণ নিশ্চিত।" (বিবেকানন্দ, ১৮৯৯, পৃ:৫১) অর্থাৎ তিনি অন্যান্য দেশের উন্নতির ক্ষেত্রে বিজাতিবিদ্বেষ ভাবনার কথা বললেও নিজ দেশের উন্নতির ক্ষেত্রে তা কখনোই স্বীকার করেননি।

বিবেকানন্দের চিন্তা-চেতনায় ভারতীয়দের ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক অনুশীলনই জাতীয় জীবনের ধারক হওয়া উচিত। আধ্যাত্মিকতার অর্থই হল সত্যকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করা তথা মানব চরিত্র সৃষ্টি করা। ধর্মকে তিনি কোনোদিনই শুধুমাত্র বাহ্যিক পূজা বিধি আচার-অনুষ্ঠান বলে গণ্য করেননি, তিনি ধর্মকে দেখেছেন এক আত্মবিশ্বাস, সততা, নিষ্ঠা, মূল্যবোধ, উদারতা ও চরিত্র গঠনের পন্থা হিসেবে। কারণ তিনি স্পষ্টতই বুঝেছিলেন এই বৈচিত্র্যময় ভারতবর্ষে মানবতাবোধ তথা ভাতৃত্ববোধ গড়ে না উঠলে জাতীয়তাবোধের ধারণা গড়ে তোলা বেশ মুশকিল। তাই তিনি প্রথমে ভারতকে একটি আধ্যাত্মিক ধর্মপরায়ণ জাতি গঠনের ভিত্তিভূমি রূপে গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। এক্ষেত্রে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল একমাত্র ভারতের অতীত গৌরব ও ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে ভারতে জাতির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গঠন করা সম্ভব। তাঁর মতে বিপ্লবের পূর্বসূরী হল নবজাগরণ এবং ভারতে এই নবজাগরণ হওয়া উচিত ধর্মীয় নবজাগরণ। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন একমাত্র বিপ্লবের পথ ধরেই এক সংস্কার শুদ্ধ সুস্থ ও সুন্দর সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব। তাই তিনি জাতি গঠনের ক্ষেত্রে মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য রাজনৈতিক আন্দোলনের পূর্বে ধর্মীয় আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর মতে ধর্মের অন্তর্নিহিত পরম সত্যের উপলব্ধি করা প্রত্যেক ভারতীয়র একান্ত আবশ্যক। কারণ এই পরম সত্য উপলব্ধি করতে পারলেই বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির মধ্যেকার বিদ্বেষভাব তিক্ততা প্রভৃতির অবসান ঘটবে এবং এক্ষেত্রে তিনি অতীত ভারতীয় সংস্কৃতির পুনর্মূল্যায়ন প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। এই পুনর্মূল্যায়নের মাধ্যমে জাতি তাঁর সাংস্কৃতিক আত্মপ্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হবে বলে তিনি মনে করতেন। মানুষের মধ্যেই যে প্রকৃত ঈশ্বরের বাস তা তিনি স্পষ্ট বুঝেছিলেন, তাই বলেছিলেন "জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

বিবেকানন্দের যথার্থ ও বিনম্র জাতীয়তাবাদী চেতনা তাঁর আন্তর্জাতিকতাবাদ ভাবনার পথ প্রশস্ত করেছিল। তিনি ভারতীয় জাতীয়তাবাদের একনিষ্ঠ সমর্থক হলেও বিশ্বের অন্যান্য জাতি ও তাদের জাতিসত্তার প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন। তিনি বলতেন নিজের জাতিকে শুধুমাত্র অন্ধভাবে বড় করে না দেখে সকল জাতির মহৎ গুণগুলিকে অনুসরণ করতে হবে, তাহলে সমাজ থেকে বিভিন্ন জাতিগত হিংসা বিবাদ ও ধর্মীয় বিদ্বেষভাব প্রতিহত করা এবং সমস্ত মানবকুলের মধ্যে আন্তর্জাতিকতাবাদ তথা বিশ্ব সৌভ্রাতৃত্ব করে

তোলা সম্ভব। তাই স্বামীজি এই বিশ্ব মানবতা বোধ শক্তিতে বলিয়ান হয়ে আমেরিকার শিকাগো ধর্ম মহাসম্মেলন সকল জাতির প্রতি মহান সমন্বয়ের উদার আন্তর্জাতিকতাবাদের বক্তব্য পেশ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তিনি তাঁর এই বক্তৃতার প্রথমেই বলেছিলেন, "Sisters and brothers of America..." -এই সম্বোধন শোনামাত্র সমুদ্রসম বিপুল জনরাশি স্বতঃস্ফূর্ত করতালি তাকে অভিনন্দন জানিয়েছিল। তিনি চেয়েছিলেন যে মানুষ তাঁর নিজের ক্ষুদ্র জাতিসত্তাকে অতিক্রম করে বিশ্ব জাতিসত্তায় সচেতন হয়ে উঠুক। তিনি যথার্থভাবেই চেয়েছিলেন আমরা মানব তাই মানব ধর্ম আমাদের কাছে শ্রেয়। বলা যায় তাঁর এই আন্তর্জাতিকতাবাদের বাণী সেইসময় সমগ্র শিকাগোর ধর্মমহাসভাকে গ্রাস করে ফেলেছিল। এই বিশ্ব সচেতন ভাবনায় বলিষ্ঠ স্বামীজি বলেছিলেন : "সত্যই আমার ঈশ্বর - সমগ্র জগৎ আমার দেশ।" তাই অফুরন্ত জাতীয়তাবাদপ্রেমিক বিবেকানন্দ জাতি-জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদ সম্পর্কে যে অবদান দিয়ে গিয়েছেন, তা এর আগে কোনো মনীষী সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করতে পারেননি।

গ্রন্থপঞ্জি:

1) স্বামী বিবেকানন্দ. (১৯৬৪). বাণী ও রচনা, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতাঃ উদ্বোধন কার্যালয়।
2) স্বামী বিবেকানন্দ. (১৯৬১). বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, কলকাতাঃ উদ্বোধন কার্যালয়।
3) স্বামী বিবেকানন্দ. (১৯৬৪). বাণী ও রচনা, সপ্তম খণ্ড, কলকাতাঃ উদ্বোধন কার্যালয়।
4) স্বামী বিবেকানন্দ. (১৯৬৩). প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য. কলকাতাঃ উদ্বোধন কার্যালয়।
5) স্বামী বিবেকানন্দ. (১৮৯৯). বর্তমান ভারত. কলকাতাঃ উদ্বোধন কার্যালয়।
6) স্বামী বিবেকানন্দ. (১৩১৯ বঙ্গাব্দ). শিক্ষা প্রসঙ্গ. কলকাতাঃ উদ্বোধন কার্যালয়।
7) চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীব. (২০১২). স্বামী বিবেকানন্দ এক অনন্ত জীবনের জীবনী দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং।
8) ভগিনী নিবেদিতা. (১৯৮৮)। স্বামীজি ও তাঁর বাণী। কলকাতাঃ উদ্বোধন কার্যালয়।
9) ভট্টাচার্য, নিমাই. (১৯৯৯)। বিপ্লবী বিবেকানন্দ। কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং।
10) Bharathi, K. S. (1998). Encyclopedia of Eminent Thinkers: The Political Thought of Vivekananda. New Delhi: Concept Publishing Company.

11) Dasgupta, S. (2009). Social Philosophy of Swami Vivekananda. Kolkata: The Ramakrishna Mission Institute of Culture.
12) Dhar, N. (1977). Vedanta and the Bengal Renaissance. Calcutta: Minerva Associates.
13) Majumdar, R.C. (1963). Swami Vivekananda- A Historical Review. Calcutta: General Printers and Publishers.
14) Mahajan, V. D. (1987). Modern Indian Political Thought. New Delhi: S. Chand & Co. Pvt. Ltd.
15) Majumdar, R. C. (2011). *Swami Vivekananda: A Historical Review.* Kolkata: Advaita Ashrama.
16) Nehru, J. (1960). *Sri Ramakrishna and Swami Vivekananda.* Calcutta: Advaita Ashrama.
17) Nikhilananda, S. (1953). *Vivekanda- A Biography.* New York: Ramkrishna-Vivekananda Centre.
18) Mukherjee, S. L. (1971). *The Philosophy of Man-Making.* Calcutta: New Central Book Agency.
19) Raghuramaraju, A. (Ed.) (2014) *In Debating Vivekananda: A Reader*. New Delhi: Oxford University Press.